অগ্রাধিকারের ফিকাহ

ইউসুফ আল কারাদাওয়ী

অগ্রাধিকারের ফিকাহ

অগ্রাধিকারের ফিকাহ বলতে আমরা বুঝি প্রত্যেকটি ইস্যু সত্যিকার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা। কোনো বড় ইস্যুকে স্থগিত রাখা যাবে না, কোনো ছোটখাটো ইস্যুকে বড় করে দেখা যাবে না, কোনো বড় বিষয়কে খাটো করে দেখা উচিত নয়। আবার কোনো ক্ষুদ্র বিষয়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না। প্রাকৃতিক বিধান ও শরীয়াহর বিধান এ দিকনির্দেশই দেয়। আমি মনে করি, আল্লাহর সৃষ্টি ও বিধান এ প্রকৃত প্রেক্ষিত মেনে চলা অবশ্যম্ভাবী করে গিয়েছে। সূরা আল আ□রাফের ৫৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ নিশ্চয় তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।

নবীর জীবনে অগ্রাধিকারের ফিকাহ

মক্কী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মিশন একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। আর এ মিশনের সর্মসূচি ছিল কেবল আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং এমন একটি বিশ্বাসী দল গড়ে তোলা যারা পরবর্তীতে সেই দাওয়াত আরবদের কাছে, অতঃপর বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। এ পর্যায়ে দ্বীনি আকীদা প্রতিষ্ঠা, তাওহীদের অনুশীলন, বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা নির্মূল এবং নেক ও সৎকর্মের চর্চার ওপর রাসূলের (সাঃ) কাজ কেন্দ্রীভূত ছিল।

এপর্যায়ের কর্মধারার প্রতি কোরআনের সমর্থন ছিল বিধায় কোরআন মুসলমানদেরকে কোনো বিশেষ গৌণ বিধিবিধানের দিকে মনোযোগ দিতে বলেনি বরং সূরা আল আসরে বর্ণিত ইসলামী ভাবধারা গড়ে তোরার ওপর সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করার তাগিদ দিয়েছে। এ সূরার ৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ কিন্তু যারা ঈমান আনে, যারা সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্য ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে থাকে।

মক্কী পর্যায়ে দাওয়াতি কাজের সময় মুসলমানরা প্রতিদিন কাবা ঘরে যে মূর্তি দেখত সেগুলো ধ্বংস করার জন্যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের হাতে কুঠাল নেয়া অথবা তাদের ও আল্লাহর শত্রুর বিরুদ্ধ লড়াই করার জন্যে তলোয়ার তুলে নেয়ার অনুমতি দেননি অথচ কাফেররা এ মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছিল। সে সময় মার খেয়ে ও জখম হয়ে তারা যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আসতেন, কোরআনের ভাষায় তিনি তাদেরকে এটিই বলতেনঃ স্বীয় হাতকে বিরত রাখ এবং নামাজ কায়েম কর। (সূরা আন-নিসাঃ ৭৭)

সব কিছুর জন্যে একটি উপযুক্ত সময় আছে। সেই নির্ধারিত মুহূর্তের আগেই যদি কিছু পাওয়ার আশা করা হয় তাতে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে।

অগ্রাধিকারের ফিকাহ ও ভারসাম্যের ফিকাহর পারস্পরিক সম্পর্ক

অগ্রাধিকারের ফিকাহ ভারসাম্যের ফিকাহর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয়েই একসঙ্গে জড়িয়ে যায় অথবা একে অপরে সমান্তরাল হয়ে দাঁড়ায় এবং আবার ভারসাম্যের প্রক্রিয়া অগ্রাধিকারের দিকে ঝুকে যায়। এভাবে এটি তখন

অগ্রাধিকারের ফিকাহর আওতায় পড়ে।

অনুপাত বজায় রাখায় প্রয়োজনীয়তা

অগ্রাধিকারের ফিকাহ্ অনুযায়ী শরীয়াহর হুকুম-আহকাম (তাকলিফ) ও আমলের ক্ষেত্রে অনুপাত রক্ষা করা আবশ্যক। শরীয়াহর ইসলাম নির্ধারিত অনুপাতে ব্যত্যয় ঘটলে দ্বীনি ও পার্থিব উভয় জীবনে দারুণ ক্ষতি হবে।

ইসলামে আমলের আগে ঈমানের স্থান। যেহেতু ঈমান হচ্ছে ভিত্তি আর আমল হচ্ছে ইমারত। ভিত্তি ছাড়া কোনো ইমারত হয় না। আমলের আগে ঈমান। আমল বহুমুখী। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি সহীহ হাদিসে বলেছেনঃ ঈমান ৭৭টি শাখায় বিভক্ত, সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো মা□বুদ নেই আর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে রাস্তা থেকে ক্ষতিকর জিনিস সরানো।

> আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর নিকট আমল কেবল একটি স্তরেই নয়, উচ্চ ও নিম্ন স্তরে বিভক্ত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বরেনঃ তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান সাব্যস্ত করে নিয়েছ- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়। আর যারা অত্যাচারী, আল্লাহ্ তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না। আর যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা মর্যাদায় আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে অতি বড়। আর তারাই হচ্ছে সফলকাম। (সূরা তওবাঃ১৯-২০)

এ কারণে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, হজ্ব সম্পাদনের চেয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ অধিকতর উত্তম। হাম্বলী ফকিহগণ এবং অন্যান্য ফকিহ তো জিহাদকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে করণীয় সর্বোত্তম শারীরিক আমল বলে অভিহিত করেছেন। অনেক হাদিসে জিহাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এর মধ্যে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসও রয়েছে। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জনৈক সাহাবি একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন- যেখানে একটি মিঠাপানির ঝর্ণা ছিল। উপত্যকাটি তার ভালো লাগে এবং বলেন, আমি আল্লাহর বন্দেগীর জন্যে কি করে অন্য লোকদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে আমি এটি করবো না। সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট তার ইচ্ছে ব্যক্ত করল এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এরূপ করো না। তোমার ঘরে সত্তর বছর ইবাদত করার চেয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা অনেক উত্তম। (তিরমিজি ও আল হাকিম)

সালমান (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদিসে কাফেরদের হাত থেকে মুসলমানদের পাহারার (রিবাত) গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ একদিন ও একরাতের রিবাত একমাসের রোজা ও রাত্রিকালীন ইবাদতের চেয়ে উত্তম এবং রিবাতের অবস্থায় কেউ ইন্তেকাল করলে তার অনুকূলে আমলে সালেহ□র হিসাব জারি থাকবে যেন সে জীবিত আছে, আর যদি জীবিত থাকে সে শয়তানের প্রলোভন থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারকের মতো একজন ইমাম জিহাদের সময় এক সৈন্যশিবির থেকে আল ফুজায়েল ইবনে ইয়াদ নামক তার এক বন্ধুকে কবিতা লিখছেন যিনি সব সময় দুই পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনার মধ্যে সফর করতেন। পঙক্তিমালা হচ্ছেঃ

ওহে দুই পবিত্র স্থানে ইবাদতকারী, তুমি যদি আমাদেরকে দেখতে, তাহলে তুমি জানতে তোমার ইবদত কেবলি খেলা। কেউ কেউ তাদের অশ্রু দিয়ে গণ্ডদেশ ভেজায়; আর আমরা নিজেদের রক্তে বুক ভিজাই......।১

প্রচলিত ফিকাহ অনুসারে নফল ইবাদতকে (ঐচ্ছিক আমল যা ফরজ ইবাদতের মতো বাধ্যতামূলক নয়) ফরজের ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়; সামষ্টিক বাধ্যবাধকতার (ফরজে কেফায়া) চেয়ে ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা (ফরজে আইন) বেশি গুরুত্বপূর্ণ; যে সামষ্টিক বাধ্যবাধকতা আদৌ কারো দ্বারা সম্পাদিত হয় না সে কাজ অগ্রাধিকার পাবে সেই দায়-দায়িত্বের ওপর যা সম্পন্ন করার জন্যে পর্যাপ্ত লোক আছে। আবার একটি গ্রুপ বা জাতির সাথে সম্পর্কিত দায়িত্ব ব্যক্তির অধিকারের চেয়ে গুরুত্ব পাবে এবং যে কাজ সম্পন্ন করার মেয়াদ সীমিত, সেই কাজ ঐ কাজের চেয়ে আগেই করে ফেলতে হবে যে কাজ করার যথেষ্ট সময় আছে।

শরীয়াহর বর্ণিত স্বার্থের গুরুত্বের ব্যাপারে ফিকাহতে বর্ণিত হয়েছে কোন বিষয়টি অধিকতর অগ্রাধিকার পাবে। যেহেতু প্রয়োজনীয় (আল মাসালিহ আল হাজিয়াহ) ও সৌন্দর্যবোধক (আল মাসালিহ আল তাহসিনিয়াহ) স্বার্থের চেয়ে অপরিহার্য (আল মাসাহিল আল

দুরুরিয়াহ) স্বার্থের প্রাধান্য রয়েছে। আবার প্রয়োজনীয় স্বার্থকে তাহসিনিয়াহর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অথচ জাতি ও ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে যখন সংঘাত দেখা দেয় তখন জাতীয় স্বার্থই অগ্রাধিকার পাবে। এখানে ভারসাম্যের ফিকাহ ও অগ্রাধিকারের ফিকাহ এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে।

অগ্রাধিকারের ফিকাহর প্রতি অবহেলা

> ইসলামী পুনর্জাগরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গ্রুপকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তাদের কাছে অগ্রাধিকারের ফিকাহ্র কোনো অস্তিত্ব নেই, যেহেতু তারা প্রায়শ মুখ্য বিষয়ের আগে গৌণ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়। সামগ্রিক স্বার্থ অনুধাবনের চেয়ে কোনো বিশেষ দিক নিয়ে গবেষণায় লেগে যায়। আর প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার পরিবর্তে বিতর্কিত বিষয় আঁকড়ে ধরে থাকে। দুঃখের বিষয়, আমরা পিঁপড়ার রক্তপাতের বিষয়ে আলোচনা করি, কিন্তু ইমাম হোসাইন (রা.) এর রক্তপাতের ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। অথবা নফল রক্ষার জন্যে মারমুখী হয়ে উঠি যখন মানুষ ফরজকে অবহেলা করছে। সারবস্তুর পরোয়া না করে খোলস নিয়ে ঝগড়া করি।

সার্বিকভাবে এ হচ্ছে আজকের মুসলমানদের অবস্থা। আমি দেখি প্রতি বছর রমযানে কিংবা অন্যান্য মাসে লাখ লাখ লোক উমরাহ পালন করে এবং কেউ কেউ দশ বার এমন কি বিশবারের মতো হজ্ব পালন করে। তারা যদি এসব নফল কাজে ব্যবহৃত অর্থ সঞ্চয় করতো, তাহলে কোটি কোটি টাকা জমা করতে পারতো। আমরা ইসলামী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে এক হাজার মিলিয়ন ডলার তহবির সংগ্রহে বছরের পর বছর ছুটোছুটি করি। কিন্তু এ অর্থের ১০ ভাগ এমন কি ২০ ভাগ বা ৩০ ভাগের এক ভাগও সংগ্রহ করতে পারি না। যদি এসব অতিরিক্ত হজ্ব ও উমরাহ পালনকারীকে তাদের ঐচ্ছিক সফরের খরচের টাকা এশিয়া ও আফ্রিকায় খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণ প্রতিরোধে বা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের কাজে লাগানোর জন্যে চান, তারা কিছুই দেবে না। এটি এমন এক পুরানো রোগ যে কোনো হৃদরোগ চিকিৎসক কখনো এর চিকিৎসা করতে পারবে না।২ অগ্রাধিকারের ফিকাহ প্রয়োগ করলে আমরা জানতে পারি অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কোন ইস্যুটির দিকে বেশি নজর দেয়া দরকার- যাতে এ ইস্যুটির জন্যে আমরা আরো বেশি শ্রম ও সময় দিতে পারি। অগ্রাধিকারের ফিকাহর আওতায় আরো জানা যায়, কোন শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি আরো বেশি কাজে লাগিয়ে তার বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং তুলনামূলকভাবে কোন লড়াই চালানোর যোগ্য। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের কয়েকটি প্রকারভেদ রয়েছেঃ মুসলমান, কাফের ও মুনাফিক।

কাফেরদের মধ্যে শান্তিকামী ও জঙ্গী মনোভাবাপন্ন শ্রেণী রয়েছে। এদের মধ্যে শুধু কাফেরই নয় বরং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন কাফেরও আছে। মুনাফিকদের মধ্যে কম মুনাফিকী করে এমন লোক রয়েছে, আবার বেশি মাত্রায় মুনাফিকীতে লিপ্ত এমন লোকও রয়েছে। তাহলে কোথা থেকে শুরু করব? কোন ক্ষেত্রটি কাজের জন্য অধিকতর উপযোগী? কোন ইস্যুটির দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে?

অগ্রাধিকারের ফিকাহ সময়ের দাবি অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন করে, যাতে নির্দিষ্ট কাজটি কাল বিলম্ব না করে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায়। কেননা সুযোগ একবার হাতছাড়া হলে তা পুনরায় আসতেও পারে আবার নাও পারে। আর আসলেও দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। একজন কবি সময়ের মূল্য সম্পর্কে বলেছেনঃ

সুযোগ কাজে লাগাও, একটি সুযোগ যদি হাতছাড়া করো, আসবে দুঃখ হয়ে।

আরবি এক প্রবচনে বলা হয়েছেঃ আজকের কাজ কালকের জন্যে ফেলে রেখো না। ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে (রা.) কিছু কাজ আগামী দিনের জন্যে রেখে দেয়ার পরামর্শ দিলে তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ আমি তো ইতোমধ্যে একদিনের কাজ করেই ক্লান্ত, তাহলে আগামীকাল দুদিনের কাজ করতে হলে কি অবস্থা হবে।

ইবনে আত্র (রা.) একটি জ্ঞানগর্ভ উক্তি হচ্ছেঃ অনেক কাজ আছে যেগুলো করার প্রচুর সময় থাকে, সেই সময়ের মধ্যে এগুলো করে ফেলা যায়। কিন্তু এমন কাজও থাকে যা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে না করলে আর করা হয়ে উঠে না। কারণ প্রত্যেক নতুন সময়ের সাথে থাকে নতুন নতুন দায়িত্ব আর আল্লাহ নির্ধারিত নতুন নতুন কাজ।

গাজ্জালী ও অগ্রাধিকারের ফিকাহ

ইমাম গাজ্জালী (র.) □আল এহিয়া□ গ্রন্থে যারা সৎকর্মের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবল ইবদত-বন্দেগীতে সন্তুষ্ট থাকে তাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আরেক দল নফলের ব্যাপারে যতোটা আগ্রহী ফরজের ব্যাপারে ততোটা নয়। আমরা দেখি তারা সকালের নফল ও রাতের তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নামাজ পড়ে খুব খুশি, কিন্তু ফরজ কাজ করে আনন্দ পায় না। কিংবা তারা সময় মতো ফরজ নামাজ আদায়েও তৎপর নয়। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণিত হাদিসের কথা ভুলে যায়ঃ আমি যে সব কাজ ফরজ হিসেবে করার আদেশ দিয়েছি সেগুলো ছাড়া আমার বান্দার আর কোনো কাজ আমার অধিকতর নৈকট্য লাভের জন্যে অধিক উত্তম হবে না। (বুখারী) আমলে সালেহ□র গুরুত্বভিত্তিক ক্রমবিন্যাস অবহেলা করা অসদাচারের আওতায় পড়ে। এক ব্যক্তির দু□টি বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে মাত্র একটি করার মতো পরিস্থিতি আছে, অথবা একটি কাজ অল্প সময়ের মধ্যে করতে হতে পারে এবং আরেকটি কাজের জন্যে প্রচুর সময় আছে, এক্ষেত্রে সে যদি ক্রমবিন্যাস রক্ষা না করে তাহলে সে বিভ্রান্ত।

এ ধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে সেখানে আল্লাহর হুকুমের বাধ্যতা ও অবাধ্যতা উভয়ই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে বিষয়টি বাস্তবিকই দ্ব্যর্থবোধক সেটি হচ্ছে কিছু কিছু বাধ্যতামূলক কাজকে অন্যান্য কাজের ওপর গুরুত্ব দেয়া। যেমন নফলের চেয়ে ফরজ আমলকে অগ্রাধিকার দেয়া, ফরজে কেফায়া□র চেয়ে ফরজে আইনের প্রতি গুরুত্বারোপ, কম দরকারী কাজ যা স্থগিত করা যায় তার চেয়ে স্থগিত করা যায় না এমন কাজের ওপর গুরুত্ব দেয়া এবং পিতার প্রয়োজনের চেয়ে মায়ের চাহিদা পূরণের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ কে আমার অধিকতর সেবাযত্ন পাওয়ার হকদার? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি চতুর্থবার প্রশ্ন করল, তার পর কে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমার পিতা। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করর এরপর কে? এবং রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেনঃ তোমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যিনি নিকটতম এবং এরপর নিকটতর যিনি। কোনো ব্যক্তি আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী এ সম্পর্কের হক আদায় করবে। যদি তার আত্মীয়দের দুজন সমমর্যাদার হন, তাহলে যার সাহায্য বেশি প্রয়োজন তাকে সাহায্য করতে হবে। আর উভয়ের চাহিদা যদি সমান হয় তবে যে বেশি দ্বীনদার তাকে সাহায্য করা উচিত।

একইভাবে কেউ যদি পিতার ব্যয়ভার মিটাতে না পেরেও আবার হজ্ব পালন করতে চায়, সে ক্ষেত্রে তার হজ্বে যাওয়া উচিত নয়। যদি যায় তবে সে মূর্খের মতো কাজ করবে। কারণ তার উচিত পিতার স্বার্থ রক্ষার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া। এভাবে সে একটি নিম্নক্রমের ধর্মীয় কর্তব্যের চেয়ে অপর একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার ওপর গুরুত্ব দেবে।

অধিকন্তু কারো যদি পূর্ব নির্ধারিত কাজের সময় জুমার নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে জামায়াতে শরিক হতে হবে। যদি সে পূর্ব নির্ধারিত কাজে যায় তাহলে সে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে- যদিও প্রতিশ্রুত কাজ সম্পন্ন করাটাও একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। কেউ যদি তার পোশাকে কিছু নাপাকী দেখে পিতামাতার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, নাপাকী অগ্রহণযোগ্য ঠিকই কিন্তু পিতামাতাকে আঘাত দেয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। নাপাকী পরিহারে সাবধান হওয়ার চেয়েও পিতামাতাকে আঘাত দেয়া থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া বেশি জরুরী।

নিষিদ্ধ কাজ ও বাধ্যতামূলক দায়িত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের অসংখ্য নজির রয়েছে। যে এসবের মধ্যে কোনো একটি বিষয়েও অগ্রাধিকারের ধারা উপেক্ষা করে সে নিশ্চিতই বিভ্রান্ত।৩

ইবনুল কাইয়েমের মত

কোন ইবাদত করা উত্তম- যে বন্দেগী করা খুব কঠিন সেগুলো, না যেগুলো খুব কল্যাণকর সেগুলো? এসব প্রশ্নে ইমাম ইবনুল কাইয়েম বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তিনি মত দিয়েছেন, একমাত্র পছন্দের ইবাদত বলতে কিছু নেই। তবে কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ইবাদত করা পছন্দনীয় হতে পারে।৪ দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দ্রব্য প্রদান করা সর্বোত্তম কাজ, এতে একজন মুসলমান আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভ করে। যখন কুফরী শক্তি কোনো মুসলিম দেশে হামলা চালায়, তখন জিহাদ সর্বোত্তম আমল। এর পরের স্থান হচ্ছে মুজাহিদদের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করা। যখন কোনো আলেম ইন্তেকাল করেন অথচ তাদের কোনো উত্তরাধিকারী থাকে না, তখন দ্বীনি এলেম অর্জন করা সর্বোত্তম কাজ। এজন্যে একজন মুসলমান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশা করতে পারে এবং তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের প্রশংসাও অর্জন করে। এভাবেই ভালো ভালো কাজগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে একে অপরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যেতে পারে।

১। সূরা আল ইমরানের শেষ আয়াতটির তাফসীরে ইবনে কাছীর এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য ইতিহাসবিদগণও একই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ২। বাশার আল হাফী□র এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা □আল এহিয়া□ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ৪০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা

করা হয়েছে। ৩। দেখুন আল এহিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০০-৪০৪, আমার বইও দেখুনঃ ইমাম আল গাজ্জালীঃ বিটুইন হিজ প্রেইজারস এন্ড ক্রিটিকস, পৃষ্ঠা ৮৭-৯৩। ৪। মাদারিজ আল সালিকীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৫-৯০, আমার বই ইবাদাত ইন ইসলাম।

সূত্রঃ নতুন সফর প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি গ্রন্থ

ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী

প্রফেসর ড. ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত ও কুশলী। ইসলামী জ্ঞানে তাঁর গভীরতা এবং সমসাময়িক বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের কি ভূমিকা হবে সে বিষয়ে সুচিন্তিত মতামতের জন্য তিনি সারা বিশ্বে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংলাপের উপর তিনি সব সময় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিখ্যাত মিশরীয় পণ্ডিত ড. ক্বারাদাওয়ীর জন্ম ১৯২৬ সালে। দশ বছর বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হেফজ করেন এবং কুরআন তেলাওয়াতের নীতিমালা, তাজবীদের উপর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি আল আজহারেই পড়ালেখা করেন। ১৯৭৩ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূল আল দ্বীন অনুষদ হতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ড. ক্বারাদাওয়ী আল আজহার ইনস্টিটিউটে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনার সময়ই তার প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে শিক্ষকদের কাছ থেকে আল্লামা বা মহান পণ্ডিত খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৫৮ সালে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর ডিপ্লোমা করেন। এর আগে তিনি আরবী ভাষা অনুষদ থেকে শিক্ষকতার সনদ পান।

ড. ক্বারাদাওয়ী মিশর সরকারের আওকাফ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বোর্ড অব রিলিজিয়াস এফেয়ার্স-এর একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি আলজেরীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ইসলামিক সায়েন্টিফিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিকাহ একাডেমী, মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর ফিকাহ একাডেমী, রয়াল একাডেমী ফর ইসলামিক কালচার এন্ড রিসার্চ জর্ডান, ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার অক্সফোর্ড-এর সদস্য, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ-এর প্রেসিডেন্ট এবং কাতার সীরাহ স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক। তিনি বাংলাদেশস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম এর ট্রাস্টি বোর্ডেরও সদস্য।

তাঁর এ পর্যন্ত ৪২টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি, তুর্কী, ফার্সী, উর্দু, ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য অনেক ভাষায় তার বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এ বইটি সহ মোট ৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন বই তিনটি খায়রুন প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। এছাড়া নতুন সফর প্রকাশনী, ঢাকা আধুনিক যুগ, ইসলাম, কৌশল ও কর্মসূচি এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, চট্টগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম প্রকাশ করেছে। ড. ক্বারাদাওয়ীর ইংরেজি ভাষায় অনূদিত www.qardawi.net/english বই ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়।

তিনি একজন স্বনামধন্য কবি। নিজস্ব কাব্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আরব বিশ্বে সুপরিচিত। বর্তমানে ড. ক্বারাদাওয়ী আল জাজিরাহ টেলিভিশনে একটি সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন। বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক শ্রোতা এ অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ইসলামের একজন সক্রিয় কর্মী। এর জন্য তাঁকে ১৯৪৯, ১৯৫৪-১৯৫৬ এবং ১৯৬৫ সালে কারাবরণ করতে হয়। আরব ও মুসলিম দেশ সমূহের প্রতি পাশ্চাত্য বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতির জন্য তিনি তাদের একজন কঠোর সমালোচক। একই সাথে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ইসরাঈলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ, একপেশে ও নিঃশর্ত সমর্থনের তিনি তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেন। ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে তার সাম্প্রতিক বক্তব্য বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগণের মতামতকে শাণিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। তিনি একজন মানবাধিকারের প্রবক্তা। নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের সপক্ষে তিনি সোচ্চার যা তার বিভিন্ন লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

ড. ক্বারাদাওয়ী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, আরব ও মুসলিম দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশেও বেশ কয়েকবার এসেছেন।